মালায় ফুলে দুয়ার সাজানোর কথা বলছি

নতুন বছর আসার আগেই বৈশাখের রুদ্ররূপ দেখেছি! একি ঋতুধর্মে পরিবর্তন, না বঙ্গে নির্বাচনী রঙ্গে ক্রমোত্থিত তাপমান তার আন্দাজ করা মুশকিল। তবে সার কথা এই, বছরকার পরব চাপা পড়ছে ভোট-পরবের ধুন্ধুমারে। নতুন বছরে কোন শুভসময়ের সূচনা হ'ল তার চাইতে নতুন সরকারে কোন কোন নতুন মুখের সমাগম ঘটবে তাই নিয়ে লোকের ভাবনা বেশি। অথচ মাঝে একটা বছর ঘুরে গেল। আমরা বাঙলা নতুন বছরের কথা বলছি। বছরশেষের দিনে আপদ-বালাই বিদেয় করে মালায় ফুলে দুয়ার সাজানোর কথা বলছি। মা-ঠাকুম্মাদের রাত জেগে পিঠে-পুলি বানানোর দিনগুলোর কথা বলছি। নববর্ষের প্রথমরোদে সন্তানসন্ততির মুখে সুখের আগমনী শোনার কথা বলছি। আমরা আত্মপরিচয়ের প্রথা পার্বনের কথা বলছি। এছাড়া কী? আজকের হাঁসফাঁস দশায় বড় বেশি মনে পড়ে পাহাড়, পাহাড়ি গ্রাম, দূরের তৃণভূমি, পার্বত্যদেশের গহীনে বেড়ে ওঠা কিম্বদন্তী, আর সেই ছেলেটির কথা...

ছেলেটি বেড়ে উঠছিল চোমোলাংমার (এভারেস্ট) গায়ের কাছে নিভৃত সোলোখম্বু মহল্লার এক গ্রামে। মাঝে রংবুক গোম্ফার ধর্মীয় পাঠশালায় সে ভর্তি হয়েছিল বটে, কিন্তু ক'দিন যেতে না যেতেই ফিরে আসে নিজগ্রামের নিরালায়। এভারেস্টের হিমেল সান্নিধ্যে কেটে যায় তার শৈশব, কৈশোর। ১৯৫০ এ হঠাৎ শহরে পা রাখা। জনৈক বন্ধুর হাত ধরে সে চলে আসে দার্জিলিং। বহুকাল পর দেখা হয়ে যায় মামার সঙ্গে। মামা সেখানে মোটামুটি এক কেউকেটা। সাহেবদের সঙ্গে তার ওঠাবসা। একদিন সে জেনে যায়, লোকটি আসলে নাকি শেরপা। 'শেরপা মানে পূবের লোক। যারা চোমোলাংমার পূবদিকে ছিল, এদিকে এসে থিতু হয়েছে। সেই হিসেবে তুমিও শেরপা। চাইলে তুমিও শেরপাগিরি করতে পারো' – মামা তাকে বোঝায়। শেরপা মানে বুঝলেও, শেরপাগিরি বুঝতে ছেলেটির সময় লাগে। কিন্তু যখন সে বুঝল - যে সাহেবরা ফি'বছর এভারেস্টের চূড়োয় উঠবে বলে জীবনপণ করে, মামা তাদের মালপত্তর বয়ে নিয়ে যাওয়ার দায়িত্বে থাকে - তার চমক লাগে। যে চোমোলাংমার শীতল শ্বাস বুকে নিয়ে বড় হয়েছে সে, যে চোমোলাংমা দেবাদিদেবের মতো আকাশের ভার শিরে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে আদি অনন্তকাল, তার মাথায় মানুষের পা পড়বে! একি সম্ভব? কে জানে। কাজটা অতীব দুঃসাহসের! 'আমাকে যেতে হবে' - মনে মনে স্থির করে ফেলে ছেলেটি। মামা যখন শেরপা-দলের সর্দার তার যেতে বাধাই বা কোথায়? অবশ্য ব্যাপার তত সহজ হ'ল না। বহু কাঠখড় পুড়িয়েও পুচকে ছেলেটিকে দলে জায়গা দেওয়া গেল না। অপেক্ষা করতে হ'ল তিনটি বছর। অপেক্ষার মধ্যেই শুরু হ'ল এক কিম্বদন্তীর বেড়ে ওঠা। তারপর ১৯৫৩। কর্নেল হান্ট'র এভারেস্ট অভিযাত্রীদলে কনিষ্ঠতম শেরপা হিসেবে সর্দারের ভাগ্নের জায়গা পাকা হ'ল। সেবারে তো সর্দার শুধু শেরপা নয়, সে একজন আরোহীও (Climber) বটে। সেবারেই (২৯ মে) এভারেস্ট চূড়োয় লেখা হ'ল ইতিহাস। এডমন্ড হিলারি'র সঙ্গে জুটি বেঁধে যে দ্বিতীয় লোকটি বিশ্বের সর্বোচ্চ শিখরে প্রথম পা রেখেছিল সে হ'ল ছেলেটির শেরপা-সর্দার মামা। হ্যাঁ, আমরা দুজন কিম্বদন্তীর কথা বলছি। আমরা তেনজিং নোরগে ও নওয়াং গম্বু'র কথা বলছি। ১৯৫৩-র ঐতিহাসিক অভিযানে গম্বু মালপত্র ফেরি করেছিল ২৬০০০ ফুটের শিবির পর্যন্ত। কবছরে মধ্যেই সে তেনজিং -এর পদাঙ্ক অনুসরণ করে শেরপা থেকে আরোহী ক্লাবে জায়গা পেয়ে গেল। সে-ই প্রথম দু'দুবার (১৯৬৩ ও

১৯৬৫) এভারেস্টের শির ছুঁয়ে ফিরে এলো। তারপর হিমালয়ে এবং বিশ্বের বিভিন্ন পর্বতমালায় তার নিত্য যাওয়া আসা চলতে থাকে। একের পর এক নজিরসৃজনী অভিযান সংগঠিত করে সে আল্পসে, আকাস্কায়, নন্দাদেবীতে শিখরে, বা কাঞ্চনজঙ্ঘায়। তার কীর্তি ও খেতাবের তালিকা বিশাল, স্বল্প পরিসরে ব্যাখান করা সম্ভব নয়। তেনজিং-এর মতো তারও ঘর-গেরস্থালি ছিল দার্জিলিংয়ে, এই বাঙলায়। দেশে আরোহণের প্রথম মহাবিদ্যালয়ের (HMI, Darjeeling) তিনি ছিলেন দ্বিতীয় প্রধান নির্দেশক, তেনজিং-এর যোগ্য উত্তরসূরি। ২৪ এপ্রিল ২০১১, দার্জিলিংয়ের বাসভূমিতেই তাঁর অন্তিম শ্বাস পড়ে। দশ বছর পর আর এক এপ্রিলে এসে মহান নওয়াং-কে স্মরণের অবকাশ এলো।

তেনজিং-পুত্র জামলিং নোরগের জন্মও এ'মাসেই (২৩ এপ্রিল)। আভিযাত্রী মহলের হয়তো স্মরণে আছে, এভারেস্ট বিজয়ের স্বর্ণ-জয়ন্তী বর্ষে এই জামলিং নোরগে ও পিটার হিলারি (এডমন্ড হিলারি পুত্র) তাঁদের কিম্বদন্তী পিতৃদ্বয়ের কীর্তি স্পর্শ করার উদ্দেশ্যে এভারেস্ট যাত্রা করেন। জামলিং ইতিপূর্বে (১৯৯৬) আরও একবার এভারেস্ট অভিযান করেছিলেন, তিনি শিখর স্পর্শ করে ফিরে এলেও সেবারের ভয়ঙ্কর পার্বত্য বিপর্যয় নিজচোখে প্রত্যক্ষ করেন। পরে অভিযানের যাবতীয় বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করেন তাঁর বিখ্যাত "Touching My Father's Soul" বইটিতে। শেরপা ও আরোহীদের পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়ে এরকম অকপট ও বিস্তারিত আলোচনা আর কেউ কোথাও করেছেন বলে জানা নেই। আমাদের 'আরোহী'র ঘরে বইয়ের সংগ্রহ মন্দ নয়, আলোচ্য বইটি জায়গা পেলে আরও ভালো লাগবে।

যখন কলম ধরেছি, লক্ষ্য করছি, কোভিডের দ্বিতীয় তরঙ্গ আছড়ে পড়েছে সারা দেশে। মাঝে সহজ সময়ের আভাষ মিলেছিল, কিন্তু আমাদেরই অবিমৃষ্যকারী আচরণ এবং ভাইরাস বিবর্তনজনিত কারণে সংক্রমণ বিপদসীমা অতিক্রম করে যাচ্ছে প্রতিদিন। এখন স্বাভাবিক জনজীবন নতুন করে প্রশ্নচিহ্নের মুখে। আমাদের কী করনীয়? একটু সমঝে চল ভাই। অভিযান থেমে থাকবে না সত্য, কিন্তু বেপরোয়া পা চালিয়ে ভাইরাসের পাতা ফাঁদে ধরা দেওয়ার কোনও মানে নেই। বরং একটু বিরতি নিলে মন্দ কী? একটু বিরতি মানে অনেক নিরাপদ পরিকল্পনার অবকাশ। ভাবুন না - ভিড় না বাড়িয়ে, বরং ভিড় এড়িয়ে কী করে কোন দূরের মুলুকে পাড়ি দেওয়া যায়!

গত সংখ্যায় দেও-টিব্বা'র গপ্পো ফেঁদেছিলাম। সে যে নিছক গপ্পো নয় নিশ্চয়ই বুঝেছেন। এবারে আর ভুল নেই। খোদ রুদ্র শুরু করেছে দেও-টিব্বা অভিযানের ধারাবাহিক। কলম ধরেছেন এই পরিবারের প্রবীণ আরোহী প্রশান্ত মণ্ডল-ও। সম্প্রতি তাঁর একটি উল্লেখযোগ্য বই 'কিলিমাঞ্জারো থেকে ককেশাসে' প্রকাশিত হয়েছে। আমাদের আশা, বৃহত্তর পাঠক-পরিবারে বইটি যথেষ্ট আদৃত হবে। শেষে বলি 'আরোহী E-ম্যাগ' আরও অনেকটা জল-হাওয়া-আলো চায়। আপনারা যত্ন না নিলে সে ডালপালা মেলতে পারবে না। ভেবে দেখবেন। ভালো থাকবেন।

কেন যাওয়া? আরোহণের শুরু থেকে শিখর পর্যন্ত যে পথ তার মধ্যেই কোথাও রহস্যটা লুকিয়ে আছে!